Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 152 –159
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

কবিতা সিংহের নির্বাচিত ছোটগল্পে নারীর সামাজিক অবস্থান ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

Women's social position and protestant voice in selected short stories of Kavita Singha

সায়ন্তনী ব্যানার্জি
প্রাক্তন ছাত্রী
বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
ইমেইল : sayantanibhp@gmail.com

Keyword
Patriarchal view, Professional problems of women, Motherhood, Family position, Sex worker, Self-establishment, Economical independence of women, Protest for rights.

Abstract
Kavita Singh was one of the literary figures of the fifties of the 20th century. Mainly known as a poet, her steps were also strong in the field of friction. As a woman, Kobita Singha's childhood, domestic life and career were filld with varied experiences and toughchallenges. Tolerant of father's strong dominating character, bearer of mother's unfulfilled dreams, 'member of husband's bureaucracy', Kobita Singha has therefore time and again explored the current problems of girls in the society and ways to overcome them through struggle. Often in radical feminist perspectives, the issue of portraying women as opposed to patriarchy in literature or other media is entwined with ideological power struggles. But Kobita Singha has remained completely neutral in the construction of her female characters. As we see depicted in the works of Virginia woolf's fan Kavita Singha, the dangerous condition of women in the society, torture, physical and mental exploitation; similarly, there is a form of artificial covering in the name of women's independence. Along with this, theirself - establishment, self - relience and rights acquisition, fierce protest against torture and strong confident voices were established through the struggle against all these adversities. At the time Kavita Singha wrote her literary works, modern feminism of the Western world had not yet awakened. Yet what interests us is how women in her stories have become aware of their position, able to express their own opinions and decisions, or at least try to do so. Therefore, in this article, we have tried to find the social position of women and the progressive tone of protest in the selected stories of Kavita Singha.

Discussion

"না, আমি হবো না মোম
আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।
হবো না শিমূল শস্য সোনালী নরম
বালিশের কবোষ্ণ গরম......
অন্ধকার আছে বলে, হতে পারি চমৎকার দুই
প্রতিমার মত এই নীল মুখ তুমি দেখবে না
তোমার বাঁপাশে তাই নিশ্চন্ত পুতুল হেন শুই
যন্ত্রণা আমাকে কাটে, যেমন পুঁথিকে কাটে উই।"[১]

কবিতা সিংহ তাঁর লেখায় বারেবারেই নারীর সামাজিক অবস্থানের একপার্শ্বিকতা ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা বলেছেন। সমাজের আরোপিত বিশেষ নারীসত্তা-র থেকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তায় উত্তরণের প্রচেষ্টা রয়েছে তাঁর লেখনীতে। তাই মেয়েদের সমাজনির্দিষ্ট ঘরোয়া আচরণ ও অবস্থান যেমন তাঁর লেখায় উঠে আসে, থাকে অসহায়তা, থাকে 'মেয়েদেরকে মোমের মতো নরম, পেলবরূপে দেখা'[২] র পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী; তেমনই থাকে এর প্রতিবাদে নারীর আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জনের লড়াই ও পরিবার বা সমাজে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্জন। তাঁর গল্পেও আমরা নারী চরিত্রের এই স্বরূপ লক্ষ করি।

'খেলতে খেলতে একদিন' (১৯৭৩) গল্পে একদিকে যেমন দেখি আধুনিক শিক্ষিতা গৃহবধূর পরিবার ও স্বামীর ওপর কর্তৃত্ব, বিশৃঙ্খল উগ্র আধুনিক জীবনচর্যা, অথচ যার ভেতরে লুকিয়ে আছে প্রাচীন সংকীর্ণ সংস্কার ও মানসিকতা; অপরদিকে দেখি অফিসকর্মী স্বাবলম্বী নারীরও সংসার তথা সমাজে নির্যাতিত অসহায় অবস্থা, সেখান থেকে বেড়তে চাওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা ও অপমানে ক্রোধে শেষপর্যন্ত মানসিক বিকৃতি ও আত্মহত্যার চেষ্টা।

গল্পের মূল চরিত্র অণিমার দেওর বীরেন ও তার স্ত্রী কণা গল্পের শুরুতেই দেখা দেয় সেজে গুজে সিনেমা যাওয়ার প্রস্তুতিতে। তারপর তাদের শিশুপুত্র দীপুকে 'ঝি' এর হাতে সমর্পণ করে আধুনিকা কণা স্বামীকে বগলদাবা করে সিনেমা দেখতে চলে যায় সেন্ট আর পাউডারের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে। এই আধুনিকা কণাই আবার অণিমাকে তার সন্তানহীনতায় বিদ্রুপ করে 'বাঁজা' বলে। অপরদিকে পাঠক জানতে পারে অর্থনৈতিক কারণে অণিমা আর তার স্বামী সুরেন যৌথ সিদ্ধান্তে তাদের প্রথম দুই সন্তানের ভ্রূণ নষ্ট করেছে। অথচ সমাজ সত্যটা না জেনে কেবলমাত্র অণিমার ওপর দোষারোপ করে, সুরেনকে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না। আমরা দেখি, সংসারে অণিমার অর্থনৈতিক যোগদান যথেষ্ট হলেও সে সাংসারিক মর্যাদা পায় না, বরং ডিপথেরিয়ার ভয়ে দীপুর পাশে বসা বিড়ালকে অণিমা লাথি মারলে 'বাড়ির দাসী পর্যন্ত অণিমাকে ছেড়ে কথা বলেনি' –

> "আরে বাবা বাঁজা তো। কী করে ষষ্ঠীর বাহনের মর্যাদা বুঝবে?"[৩]

আর যে স্বামী অণিমার ওভার টাইমের টাকা চুরি করে, সেও অণিমার দ্বারা নিজেকে নির্যাতিত প্রমাণ করার চেষ্টা করে–

> "ও ভেবেছে ওর টাকায় কেনা গোলাম আমরা, যা করবে তাই সইতে হবে আমাকে, বুঝলে কণা"[৪]

অথচ গল্প অগ্রসর হলে এক শীর্ণ বিধবা বৃদ্ধার বয়ানে পাঠক জানতে পারে এক সংকীর্ণ গলিতে ঝুপরি ঘরে প্রথম সাংসারিক জীবন কেটেছে অণিমার চাকরির পূর্বে, যেখানে তাকে সহ্য করতে হয়েছে স্বামী সুরেনের দৈহিক অত্যাচার। বিধবার বয়ানে ফুটে ওঠে অসহায় স্বামীনির্ভর গৃহবধূর সমঝোতা, স্বামীকে তুষ্ট রাখার প্রয়াস ও এক উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণের আশা –

> "আহা তার বরটা নাকি তাকে খুব মারতো। তবু নাকি সে শাড়ি কেটে পর্দা বানাত, ঘর সাজাত, স্বামীকে খুশি করার জন্য কত রকম রান্না করত। ...ঘটির মেয়েতো, জানতো না কিছুই। তাই আমার কাছে শিখতে আসত। ...একটা মাটির ভাঁড় কিনে এনে একবার বলে কি, মাস মাস পয়সা জমাব। এক বছরে না হোক দশ পনেরো কুড়ি বছর পরে আমার বাড়ি হবে – আর বেশি নয় দুটো বাচ্চা! তা স্বামীটা ভাঁড়ে পয়সা পুরো হতেই ভেঙে সব নিয়ে নিলো।"[৫]

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-15
Website: www.tirj.org.in, Page No. 152-159

এরপর অণিমার স্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি, অণিমা চাকরি পাওয়ার পর প্রথম মাইনেয় স্বামীর সঙ্গে বসে চা খাবার উৎসাহে দামী চা কিনে অবেলায় ফিরে এসে তার স্বামীর বুকের তলায় এক উল্কিকাটা মাঝবয়সী ঝি ক্লাসের স্ত্রীলোককে দেখেছিল। তখন অণিমারা ভালোপাড়ায় চলে এসেছে। স্বামীর এই প্রতারণা অণিমার মন থেকে সমাজের গড়ে তোলা প্রচলিত স্ত্রীসত্তার সমস্ত কোমলতা, সহ্যশীলতা, মানিয়ে নেওয়ার শিখনগুলো মুছে দিল। সংসার তার কাছে তিক্ত ঘৃণ্য নরক হয়ে উঠল। আর এরপর থেকে ধীরে ধীরে শুরু হল তার সমঝোতাহীন, প্রেমহীন, আত্মবিতৃষ্ণ, নিরাসক্ত ও কখনো কখনো প্রতিবাদী ক্ষুব্ধ যাপন – যা তাকে ক্রমশ আত্মহত্যার বিকৃত আকাঙ্ক্ষার দিকে ঠেলে দিল।

আমরা দেখি অণিমা তার স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণায়, স্বামীর এককালে তাকে দেওয়া দুর্গাপ্রতিমার উপমার কথা মনে করে আজকাল পুজোর দিনে দুর্গার মুখ দেখে না। তার এই ক্রোধের মধ্যে কোথাও যেন সুপ্ত থাকে তার প্রতিবাদী মনও। এক কালে একটু আদরের লোভে সে স্বামীকে দেখিয়ে,

> "ভাঙাচোরা মূর্তির মতো থাকত, ...আজকাল আর স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে দুঃখের চ্যারিটি শো করে না। বরং স্বামী যাতে তাকে কোনো সময়েই আলাদা করে দেখতে না পায়, সেই চেষ্টাই করে। আজও সকালে তাই চটা ওঠা দেয়ালের সঙ্গে তার আধময়লা মিলের শাড়ি আর শরীরের পাঠকিলে রঙ নিয়ে মিলিয়ে রইল।"[৬]

পূর্বে অণিমার নিজেকে স্বামীর উপভোগ্য করে তোলার প্রবল প্রয়াস আর আজ তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান আমাদের সামনে স্পষ্ট করে সামাজিক আরোপিত দায়ভারের বিরুদ্ধে অণিমার পরিবর্তিত ব্যক্তিগত অবস্থান, যার মধ্যে ঘৃণা ক্রোধ হতাশা সম্পৃক্ত হয়ে থাকলেও তা অণিমাকে এক স্বতন্ত্র বলিষ্ঠ স্বর ও প্রতিবাদী অবস্থান প্রদান করে। তাই সে নিজের চারপাশে নিজেরই গড়ে তোলা রেলিঙগুলো ডিঙিয়ে তার মায়ের কাছে ফিরতে চাইল। সেই স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চাইল, যেখানে অণিমা নির্ভীক, 'নির্ভেজাল', 'খাঁটি'–

> "ছোটোবেলায় মা কাঁসার বাটিতে দুধ দিত। দুধ খেয়ে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে অণিমা মেরুদন্ড সোজা করে, চিবুক উঁচিয়ে খেলার দিকে, পড়ার দিকে মুখিয়ে দাঁড়াত।"[৭]

আর এই স্মৃতিই অণিমাকে উজ্জীবিত করল 'পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পাঁচ বছরের খুকির মতো, বেমানান ক্রোধী হয়ে'[৮] উঠতে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল, আজ বাড়িতে খাবে না, অফিস থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে, বাড়ি ফিরবে দেরী করে; এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীপুকে আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিয়ে ('ফিরবোই না, গাড়ি চাপা পড়ে মরব'[৯]) বেড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে মরতে পারল না, ফিরে এল; আর সেই ব্যর্থতার হীনমন্যতায় ভুগতে লাগল।

এরপর শুরু হল এক অদ্ভুত খেলা। আত্মহননের জন্য ঘুমের ওষুধ সংগ্রহ করতে সে নানা দোকানে কৌশলী পদক্ষেপ রাখল। এক একটা ওষুধ তার কাছে এক একটা ঘুঁটি। সঙ্গে চলতে থাকল তার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার পর্যায়ের নানা স্থানে গিয়ে সেখানের মানুষদের থেকে নিজের সম্পর্কে মূল্যায়ন আদায় করা। সেগুলোও যেন ঘুঁটি। অণিমার এই পরিভ্রমণ আমাদের নিয়ে গেল বিনয়ের (সুরেনের বন্ধু) স্মৃতিতে, যার কাছে অণিমা নানা সাংসারিক পরামর্শ ও সান্ত্বনা পেত; আর একদিন সুরেনের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অণিমা এই বিনয়ের কাছে কতকগুলো ফুল নিয়ে গিয়ে 'সম্বন্ধটাকে একেবার মাংসে ক্লেদে নামিয়েছিল।'[১০] আমরা জানলাম সেই নার্সের কথা যে টাকার বিনিময়েও ভ্রূণহত্যার সময় অণিমাকেযথেষ্ট অ্যানেস্থেসিয়া দিতে কার্পণ্য করেছিল। এখানে থেকে অণিমার জীবনের নানা পর্যায়ে তার সামাজিক অবস্থান ও সেই প্রেক্ষিতে তার প্রতিক্রিয়াগুলি ফুটে ওঠে। এভাবে সে পনেরোটি ঘুমের ওষুধ তথা ঘুঁটি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরল। তার এই আত্মহননের প্রস্তুতির মধ্যে হতাশাজনিত বিকৃতি আছে ঠিকই, কিন্তু এর মধ্যেই আছে এক আত্মসমীক্ষা ('কোথাও নিশ্চয়ই ফাঁকি ছিল। জল মেশানো কিংবা ভেজাল'[১১] ও জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই এর এক নিজস্ব অভিনব চ্যালেঞ্জ-

> "...অণিমা আজ খুব পরিতৃপ্ত। কারণ আজ সন্ধ্যেবেলা সে প্রথম শিখল দুঃখ থেকে এই পৃথিবীতে কীভাবে খেলা বানাতে হয়।"[১২]

তাই তার ঘুমের ওষুধ মেশানো জলের গ্লাসটা বেড়ালে ফেলে দিলেও অণিমা ফের প্রস্তুতি নিতে লাগল সেই খেলার–

> "খেলতে যখন শিখে গেছে তখন খেলাই চলুক – খেলা চলুক ...তারপর এভাবেই খেলতে, খেলতে .... একদিন!"[১৩]

আর গল্পের এই সমাপ্তি একই সঙ্গে হয়ে উঠল নেতিবাচক ও ইতিবাচক, একাধারে অণিমার অসহায়তা ও প্রতিবাদের গল্প, অণিমার হেরে যাওয়া ও জিতে যাওয়ার আখ্যান।

কবিতা সিংহের 'চিত্' (১৯৭৭) গল্পটিতে পাই এক সদ্যযুবতী মেয়ে পুতুলের আখ্যানকে কেন্দ্র করে এই বিশেষ বয়সী মেয়েদের উঠতি যৌবনের সমস্যাসংকুল সামাজিক পরিস্থিতি; পাশাপাশি থাকে এক যৌনকর্মী মায়ের বলিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠা, আর এই মায়ের পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা পুত্র পুলিনের ধর্ষিত যুবতী পুতুলের প্রতি সংযত, সাহসী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী– যা শেষপর্যন্ত পুতুলের জীবনকে এক সদর্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে দেয়।

গল্পে দেখি কলকাতায় দিদির সঙ্গে এসে পুতুল গলির ছেলেদের কুনজরে পড়ে –

> "...তানীদের দড়ির চারপাই-এ বসে পাড়ার উঠতি বয়সেরছেলের পাল, গুলতানি করা ছেলের পাল, পুতুলকে দেখছিল। ...পুতুল আসার পর থেকেই যেন এই গলিতে, এই পাড়ায় সারাক্ষণ যেন মাংস রান্না হচ্ছে।"[১৪]

এমনকী পুতুলের দিদি অর্থাৎ পুলিনের বন্ধু হারানের বউ পর্যন্ত পুতুলের এই 'রি রি যৌবন'[১৫] নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। পুতুলের যৌবনকে এই 'রি রি' বিশেষণে বা 'মাংস'-র সঙ্গে উপমিত করে কবিতা সিংহ নারীর পণ্যায়নের দিকেই ইঙ্গিত করছেন। গ্রাম থেকে শহরে এসে পুতুলের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করে পুলিন–

> "বড়ো বেশি শরীর পুতুলের শরীরে। বড়ো উগ্র। আগে যখন কাছে আসত পুতুল একটা ফিকে লেবুতেলের সুবাস লাগত পুলিনের নাকে। গা থেকে উঠতো গাঁ দেশের ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। এখন মনে হয় পুতুলের চাপ চাপ চুলের ভারে কেবলই বর্ষা স্যাঁতা শরীরে ঘাম আর বাসন মাজার গন্ধ।"[১৬]

আর এই 'বড়ো বেশি শরীর' যুক্ত পুতুলকে একদিন কলকাতার কাছে মফস্বলে, তার হাট করে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকটা ছেলে তুলে নিয়ে যায়। তারপর ধর্ষণ করে রেললাইনের ধারে ফেলে দিয়ে যায়। আর তাই তার দিদি পুষির স্বামী হারান তাকে কলকাতায় এনে নিজের বউ বলে পরিচয় দিয়ে রাখে – হাসাপাতালে গিয়ে তাকে আবার 'কুমারী' করে আনবার জন্য। তারা ভেবেছিল কাউকে না জানিয়ে গোপনে 'বুদ্ধি করে কাজ হাসিল করতে পারলে পুতুল দিব্যি কুমারী বনে ফিরে আসবে।'[১৭] এই যে এক সদ্য যৌবনা মেয়ের ধর্ষণ ও তা লুকিয়ে পরিবারের নিজেদের সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা, বা তার প্রকাশ্যে অপরাধী পুতুলের জন্যই সবার লজ্জা ও তাকে পুনরায় 'কুমারী' করে আনার 'কাজ হাসিল' করা – এ সমস্তই প্রমাণ করে মেয়েদের সামাজিক দুরাবস্থা। এমনকী হারানও জামাইবাবু হবার সুবাদে শ্যালিকা পুতুলকে 'বিরক্ত' করে। আবার আমরা দেখি পুতুলের দিদি পুষি একসময় পুতুলের মতোই ঝকঝকে ছিল, আর আজ সংসারের চাপে – 'হাতে গলায় বুকে কণ্ঠায় নিম্নমুখী স্তনে কেবলই শেকড়।'[১৮] এ সমস্তই আমরা দেখি পুলিনের চোখ দিয়ে। পুলিনের দৃষ্টিতেই অপ্রশস্ত গলির একই ছাঁচে ঢালা স্বাতন্ত্র্যহীন মেয়েদের জীবনকে দেখি –

> "...নিজের নিজের খোপের সামনে, বাসন মাজতে, কিংবা কাপড় কাচতে বসেছে মেয়েরা। ...এত বাইরের লোক যাতায়ত করে যে মেয়েরা কেউ মুখ তুলে চেয়েও দেখে না। কিংবা হয়তো তাদের আর কিছু দেখবারই ইচ্ছে বাকি নেই। পুলিনের তো সবাইকেই এক রকম মনে হয়। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা। বেরঙা শাড়ি পরা ভাঙাচোরা কতকগুলো মেয়েমানুষ।"[১৯]

গতানুগতিক জীবনে সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি বিসর্জন দেওয়া নির্লিপ্ত অভ্যাসজর্জর মেয়েদের এই চিত্রটির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অন্যদিকে পুলিনের স্মৃতিতে আমরা পাই তার যৌনকর্মী মায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ উচ্চারণ। পুলিনের স্কুলের মাস্টার তার মাকে সন্ধ্যাবেলা যৌনকর্মের সময় ছেলেকে নাইট স্কুলে পাঠাবার পরামর্শ দিলে তার মা স্পষ্টস্বরে বলে–

> "এটা আমার পেশা। এতে তো কোনো লজ্জা নেই বাবু! ও সব জানুক। তাতে কী ?"[২০]

আর সাহসী সৎ মায়ের এই স্মৃতিই পুলিনের মনে পুতুলের প্রতি স্নেহপূর্ণ প্রেমের জন্ম দেয়। মায়ের অ-রক্ষণশীল পরিচর্যা পুলিনের মনে তথাকথিত 'নষ্ট' মেয়েদের প্রতি ঘৃণা জাগায় না, জাগায় সমানুভূতি। তাই শেষপর্যন্ত সে পুতুলকে নিয়ে কাকদ্বীপে গিয়ে এক নতুন সুস্থ সুন্দর জীবন শুরু করতে চায়, ধর্ষিত পুতুলের সন্তানকে নষ্ট না করেই। আর গল্পের পরিণতিতে এই বলিষ্ঠ মায়ের স্মৃতিলালিত পুলিনের সিদ্ধান্তে সরল পুতুলের সমর্থন ও উভয়ের সাহসী পদক্ষেপে ইতিবাচক পরিণতির নির্মাণ যেন সমাজের সমস্ত কালিমাকে আঘাত করে যায় দৃঢ়তার সঙ্গে।

কবিতা সিংহের 'হাস্নুহানা আছে' গল্পে এক অভিজাত বিধবা বৃদ্ধার আধুনিক ছেলেমেয়ের পরিবারে বর্তমান অবস্থান ও তাঁর চোখে ও স্মৃতিতে নানা স্তরের নারীর সামাজিক অবস্থিতি এবং দাম্পত্যের এক অভিনব মূল্যায়ন পরিলক্ষিত হয়।

গল্পে দেখি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ছেলেমেয়ে বউমার অতিসাবধানতায় বৃদ্ধা মা সুষমা রান্নাঘরে ঢুকতে পায় না। একসময় সংসারের কতৃত্ব যাঁর হাতে ছিল, সেই সুষমা আজ নাতির জন্মদিনে মনমতো রান্না করে খাওয়াবারও অনুমতি পান না। আসলে, সুষমা বোঝেন, তাঁর জন্য উদ্বিগ্নতা বা চিন্তা শুধু নয়, এই সবাধানতার পেছনে রয়েছে অর্থৈনিতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছেলেমেয়েদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার প্রয়াস। তাঁর ছোটো মেয়ে মিলি 'সরু লাইনের মতো সুদৃশ্য প্লাকড ভুরু তুলে' বলে-

> "...তোমার তো আর পূর্ণিমা পিসির মতো অবস্থা নয় যে না করলেই নয় – রান্না খাওয়া বন্ধ। ...আমাদের হাতে এসব ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে তুমি একটু বিশ্রাম নাওতো এবার।"[২১]

সুষমার চোখ দিয়েই আমরা এই পরিবারের অন্য দুই নারী-সুষমার কন্যা ও পুত্রবধূর মূল্যায়ন করতে পারি। ছোট মেয়ে মিলি তাঁদের ফ্ল্যাটের পাশেই ফ্ল্যাট নিয়েছে – যখন খুশি যাতে বাপের বাড়ি আসতে পারে; এই সুযোগ বা অনুমোদন – কোনটিই সুষমাদের সময় হলে জুটত না। আর পুত্রবধূ নীপা তার ঘরকে ঝকঝকে আধুনিকতম করে রাখতে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত–

> "চারজন পরিচারক তো নীপার হুকুম তামিল করতে করতে হিমশিম খায়। দরজায় পেতল ঘষো, সোফার পায়া পালিশ করো, ...ইনডোর প্ল্যানটে জল দাও, ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে পাতা মোছো, কাচের আসবাবে স্পিরিট লাগাও।"[২২]

এই বিবরণ থেকে আধুনিক গৃহবধূর পরিবর্তিত পারিবারিক অবস্থান লক্ষিত হয়। কিন্তু কবিতা সিংহ এই আধুনিকা স্বাধীন গৃহবধূর সঙ্গে সুষমার বিবাহপরবর্তী রক্ষণশীল জীবনের স্মৃতিকে পাশাপাশি উপস্থাপন করে খুব সন্তর্পণে দেখিয়ে দিয়েছেন, নারীর অবস্থানগত উত্তরণের কৃত্রিম দেখনদারিত্ব নষ্ট করে দিয়েছে সূক্ষ্ম প্রেমের অনুভূতি, সম্পর্কের গভীরতা ও সহজ সুন্দর জীবনের মাধুর্যকে।

সুষমার স্মৃতিতে আমরা পৌঁছে যাই তাঁর সদ্যবিবাহপরবর্তী সময়ে, যখন রক্ষণশীল বাড়ির গৃহবধূরূপে তাঁর জীবন কাটত পরাধীনতায়। শ্যামবাজারের ঘুপচি ঘরে গরমের মধ্যে সারাদিন রান্না ও নানান গৃহকর্মে প্রায় অনবসরে জীবন কাটত তাঁর –

> "সার সার উনুন। আঁশ। নিরামিষ। মাঝখানের ছোট উনানে গরম জলের কেটলি বসানোই থাকত। বিকেলের চুল না বেঁধে উনুনের জ্বলন্ত কয়লাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাগে দুঃখে তাঁর চোখে জল আসত।"[২৩]

তাঁর স্বামী রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে যেতেন বলে তাঁকেই দোষারোপ করতেন শাশুড়ি –

> "সন্ধে বেলা ধরে রাখতে পারনি বাপু!"[২৪]

কিন্তু শাশুড়ি জানতেন না, এর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল প্রেমের আলতো অনুভূতি –

> "...কেলাব থেকে ফেরার পথে মল্লিক বাড়ির বাগান থেকে একগুচ্ছ হাস্নুহানা পকেটে ভরে গোপনে চলে আসে মানুষটা। কখন নিয়ে আসে তবক দেওয়া মিঠে পাতি...। কী করে জানবেন গোপন সুধা কোথায় কীভাবে কখন জমে জমে ওঠে।"[২৫]

আর এই স্মৃতির অনুষঙ্গেই তিনি বাস্তবে বর্তমানে ফ্ল্যাটের পাশের বস্তির এক অত্যাচারী স্বামী ও নির্যাতিত স্ত্রীর আপাত তিক্ত সম্পর্কের সামাজিক তকমার বাইরে এক অন্য অনুভূতিপূর্ণ যাপনকে আবিষ্কার করেলন, যা সমাজের উচ্চস্তরের কৃত্রিম সভ্য মাপা মাপা সম্পর্কগুলির মধ্যে থেকে আজ লুপ্ত –

> "সুষমা দেখলেন পরশু রাতের মাতাল স্বামীর হাতে পিটুনি খাওয়া বৌটি তার স্বামীর নাগাল ছাড়িয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। ছেলেটি পকেট থেকে একটা গোড়ে মালা বের করে বৌ-এর হাতে দিল। বউটি আস্তে সরে এসে আলতো করে মাথা রাখল স্বামীর শার্টমোড়া বুকে। ...পরশু রাতের মারটুকুই সকলে জানল, কিন্তু আজকের এই গোপন-নিভৃত শান্তি? এটা কিন্তু সকলের অগোচরে রইল।"[২৬]

আর এই প্রেমের পূর্বস্মৃতি ও বর্তমান দৃশ্য সুষমাকে পারিবারিক ইচ্ছাপূরণের লড়াই এর জগৎ থেকে সড়িয়ে নিয়ে গেল এক অন্য আস্বাদনে–

> "চোখ বন্ধ করলেন তিনি, হাত বাড়ালেন। আর তখনি যেন হাতে পেলেন এক থোপা অমর্ত্য হাস্নুহানা।"[২৭]

প্রেমের অনুরণনে তৈরি হল তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র জগৎ।

কবিতা সিংহের 'ক্ষমা' (১৯৮৭) গল্পটিতে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী দুই নারীর, শাশুড়ি ও পুত্রবধূর পারিবারিক নির্যাতন, তাদের পারস্পরিক আদানপ্রদান ও শেষে পুত্রবধূটির আপাত প্রতিবাদী উত্তরণের কথা পাই – আসলে যার মধ্যে নিহিত থাকে অসহায় সহনশীল সমঝোতাবাদী শাশুড়িরই এক পরিমার্জিত রূপ।

গল্পে দেখি, লতা-দেবকুমারের প্রেমজ বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে লতা দেখে অত্যাচারী মদ্যপ শ্বশুরের রূপ আর নির্যাতিত, সাংসারিক কর্মে ক্লান্ত জীর্ণশীর্ণ শাশুড়ির অবস্থান। লতার চোখ দিয়ে আমরা তার শাশুড়ি মণিমালা সহ বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের, এমনকী লতার নিজেরও যে আচরণ বা যাপন লক্ষ করি, তাতে বিংশ শতকের আশির দশকের আধা রক্ষণশীল সংকীর্ণ পুরুষতান্ত্রিক আবহ ও সেখান থেকে ক্রমপরিবর্তমান সমাজের আপাত উত্তরণের ইঙ্গিত – উভয়ই পরিস্ফুট হয়। আমরা দেখি, মণিমালা শাশুড়ি হয়েও এখনও পরিবারে নতুন বউ-এর মতো 'সন্ত্রস্ত্র শশব্যস্ত' হয়ে থাকে – এই বুঝি পান থেকে চুন খসল। অর্থাৎ পরিবারে তাঁর গৃহবধূ হিসেবে সম্মানপূর্ণ বা কর্তৃত্বময় অবস্থান ছিল না, তিনি ছিলেন স্বামীর অধীনস্ত সংসার ও সেবাকর্মের বাহকমাত্র। স্বামী কর্তৃক দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে 'মনের সমস্ত দরজা যেন ভয়ংকর একটা ভীতির তলায় বন্ধ হয়ে'[২৮] থাকত। মণিমালার নামটি পর্যন্ত হারিয়ে গিয়েছিল সংসারের গতানুগতিক যাপনে, যেমন হারিয়েছিল তাঁর নিজস্ব অস্তিত্ব। প্রচুর পণ দিয়ে এবাড়িতে বধূ হয়ে এসেও 'ক্রীতদাসীর' মতোই জীবন কাটত তাঁর। আর তাই তিনি বারবার আশ্রয় নিতে চাইতেন পুত্রবধূ লতার কাছে। বাড়ির এই পুরুষতান্ত্রিকসংকীর্ণ বাতাবরণ বাড়ির মেয়েদেরও গড়ে তুলেছিল পুরুষের উপভোগ্য হয়ে ওঠার প্রচলিত শিক্ষায় –

> "[লতার] ননদ বিয়ে হবে বলে রূপটান মাখছে, চুলের গোড়ায় তেল মালিশ করছে। রোদে বেরোয় না। লেখাপড়ার বালাই নেই। সিনেমা পত্রিকা উল্টে ছবি দেখে।"[২৯]

কিন্তু লতাকে আমরা প্রথম থেকেই এক আত্মসম্মানে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করতে দেখি। গৃহপ্রবেশের দিন ঘরে ঢোকার মুহূর্তেই শ্বশুরের তিরস্কারে 'লতা সঙ্গে সঙ্গে ধনুক ছিলার মতো ছিটকে সদর দরজার বাইরে চলে'[৩০] আসে। এরপর শ্বশুরবাড়িতে এলেও সে নীচের ঘরে সারাদিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এরপর আমরা দেখি লতা স্কুলে চাকরি পায় এবং তারপর থেকেই তাদের দাম্পত্যে চিড় ধরে। সকাল সকাল চা জলখাবার খেয়ে কর্মব্যস্ত লতা স্কুলে বেড়িয়ে পড়ে, ফলে দেবকুমার নিজের পরিতুষ্টির জন্য যথেষ্ট সময় বা মনোযোগ পায় না লতার থেকে। এরপর স্বনির্ভর লতা গৃহকর্মে দেবকুমারেরও যোগদান প্রত্যাশা করলে দেবকুমার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু লতা এক্ষেত্রে শাশুড়ির মতো সব মেনে নেয় না, সেও প্রত্যুত্তর করে –

> "শোনো, তোমার ভিতর তোমার বাবার রক্ত থাকতে পারে। কিন্তু আমার ভিতর তোমার মার রক্ত নেই।"[৩১]

দেবকুমারের লতার থেকে যে সমস্ত প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক প্রত্যাশা রয়েছে (অফিসফেরত দেবকুমারকে দেখে লতা উঠে দাঁড়াবে, হাসবে, তোয়ালে সাবান এগিয়ে দেবে, ছাড়া শার্টটা হ্যাঙ্গারে ঝোলাবে, জলখাবার নিয়ে আসবে), দেবকুমার লতাকে যে চিরাচরিত ঘরোয়া কোমল আজ্ঞাকারী গৃহবধূ রূপে দেখতে চায় – সেই প্রত্যাশা পূরণে লতার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। লতার মনে হয়,

> "তার স্কুলে হেড মিসট্রেসের ঘরের সামনে টুলে একটা পিওন বসে থাকে। হে হুবহু হেড্‌ মিসট্রেসকে দেখলে এমনি করে।"[৩২]

তাই তাদের দাম্পত্য ক্রমে এক তিক্ত পরিণতির দিকে এগোয়, তাদের দেহমিলনও হয়ে ওঠে নিতান্ত প্রায়োজনিক প্রবৃত্তি চরিতার্থের অঙ্গ। আর একদিন তাই দেবকুমার লতার সঙ্গে জোর করে মিলিত হতে চাইলে দেবকুমারের সঙ্গে হাতাহাতিতে লতার নখ লেগে দেবকুমারের চোখের তলায় রক্তপাত হয়। এই ঘটনা গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। লতা আশ্চর্য হয়ে শোনে, শাশুড়ি দেবকুমারকে পরামর্শ দিচ্ছে লতাকে 'বেধড়ক মার' দেবার জন্য। এবং সেই পরামর্শ অনুযায়ী

দেবকুমার লতাকে তিরস্কার করে মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু লতা এখানে প্রবল ক্রোধে প্রতিবাদ জানায়, দেবকুমারকে চরম অপমান করে –

> "বেড়াল ছোট্ট জন্তু। কিন্তু তাকেও মানুষ যখন মারতে মারতে কোণঠাসা করে, তখন সে অমনি আঁচড়ে কামড়েই দেয়। বিশাল একটা পুরুষ হয়ে একজন মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লজ্জা করে না।"[৩৩]

এর প্রতিক্রিয়ায় দেবকুমার লতাকে সবার সামনে উঠোনের মাঝখানে ফেলে প্রচন্ড মারে। আর লতা, এই অপমানে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ঘরে ঢুকে আগুন জ্বেলে আত্মহত্যা করতে সচেষ্ট হয়। লতার এই আত্মমর্যাদা, এই নিজস্ব স্বর প্রতিষ্ঠা, এই প্রতিবাদী চেতনা, এই অধিকারবোধ তাকে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অনেকখানিই স্বতন্ত্র করে তোলে। এসম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কবিতার গল্প সম্পর্কে বলা সমরেশ বসুর এক উক্তি –

> "ক্রোধ যে কেবলমাত্র একটা ভঙ্গি মাত্র না, ক্রুদ্ধ যুবতীদের কথা লিখতে গেলে যে কেবল বিকৃত অভিব্যক্তি প্রকাশের দ্বারা ফুঁসে ওঠা বোঝায় না, মাত্রাহীন অশ্রাব্য এবং ভুলে ভরা শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের অযথা জটিলতার প্রশ্রয় দেওয়া না, বাংলা গল্পের নতুন চরিত্রদের আমাদের সামনে উপস্থিত করতে গিয়ে, তিনি, অনায়াসেই পাঠকদের তা বুঝিয়ে দেন। স্বাভাবিক কারণ, ক্রোধের গভীরে যে অপমান, লাঞ্ছনা, বেদনা অন্তর্নিহিত হয়েছে, সেই মর্মান্তিক সত্য সন্ধানই তাঁকে কথাশিল্পী করে তুলেছে।"[৩৪]

এ গল্পে যদিও আত্মহত্যার চেষ্টার পর লতা-দেবকুমার বাধ্য হয়ে পরিবার থেকে ছিন্ন হয়ে এক আলাদা ফ্ল্যাটে বসবাসে যায় এবং সেখানে আপাত স্বাধীনতা বা আত্মমর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের আড়ালে লতা আসলে এক রিফাইন্ড মণিমালা-র মতোই একটু পরিশীলিত ভাবে আদতে স্বামীর সন্তুষ্টি ও সমঝোতাকেই বেছে নেয়, তাদের দাম্পত্য পরিচালিত হয় উভয়েরই এক সমঝোতাপূর্ণ অবস্থানে, তবুও সেই সময়ে দাঁড়িয়ে লতার এই আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইটা আমাদের অভিভূত করে নিশ্চয়ই।

এভাবে আমরা কবিতার গল্প অলম্বনে নারীর তৎকালীন সামাজিক অবস্থানের নানা বিচিত্র স্তর যেমন লক্ষ করলাম তেমনই দেখলাম সেখানে থেকে উত্তরণের প্রয়াসে, নিজস্ব মতামত ও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠায়, সমানাধিকার অর্জনে তাদের বলিষ্ঠ আচরণ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। ১৯২৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় 'বাঙালী সমাজ' এ লেখা হয় যে নারীদের কর্তব্য বিষয়ে সমাজ সচেতন, তাদের অধিকারের বিষয়ে নিষ্ক্রিয়।[৩৫] আর এখানেই কবিতার নারীরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সমাজ তাদের যে আরোপিত কর্তব্যজালে বাঁধতে চায়, তার অস্তিত্বকে পুরুষানুগ করে রাখতে চায় – এর বিরুদ্ধেই কবিতার নারীরা লড়াই করে, অর্জন করতে চায় স্বতন্ত্র নারীত্বের মর্যাদা।

তথ্যসূত্র :

১. সিংহ, কবিতা, না, দ্র. কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা,কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২০ / মাঘ ১৪২৬, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৭১
২. ভৌমিক, প্রমিতা, ফিরে দেখা কবিতা সিংহ, দ্র. কালি ও কলম, ডিসেম্বর ৫, ২০১৫ (পৃষ্ঠা অনুল্লিখিত)
৩. দাস, সমরেন্দ্র(সম্পা.), কবিতা সিংহ পঞ্চাশটি গল্প, হাওড়া : সহজপাঠ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৭
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. তদেব, পৃ. ১৭
৭. তদেব
৮. তদেব
৯. তদেব, পৃ. ১৮
১০. তদেব, পৃ. ২৩
১১. তদেব, পৃ. ২৪

১২. তদেব
১৩. তদেব
১৪. তদেব, পৃ. ১৪৮, ১৫১
১৫. তদেব, পৃ. ১৫১
১৬. তদেব, পৃ. ১৪৮-১৪৯
১৭. তদেব, পৃ. ১৫১
১৮. তদেব, পৃ. ১৫৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৪৯
২০. তদেব, পৃ. ১৫২
২১. তদেব, পৃ. ১৫৬
২২. তদেব, পৃ. ১৫৭
২৩. তদেব, পৃ. ১৫৮
২৪. তদেব
২৫. তদেব
২৬. তদেব
২৭. তদেব, পৃ. ১৫৯
২৮. তদেব, পৃ. ৩২৭
২৯. তদেব
৩০. তদেব, পৃ. ৩২৬
৩১. তদেব, পৃ. ৩৩০
৩২. তদেব
৩৩. তদেব, পৃ. ৩৩১
৩৪. বসু, সমরেশ, একজন পাঠকের কথা, দ্র. কবিতা সিংহ / পঞ্চাশটি গল্প, (সম্পা. সমরেন্দ্র দাস), হাওড়া: সহজপাঠ, জানুয়ারি ২০১৩, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৪১৯
৩৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদকীয়, জননী ও জায়া, ১২ জানুয়ারি, ১৯২৩, দ্র. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, বাংলায় সন্ধিক্ষণ / ইতিহাসের ধারা (১৯২০-১৯৪৭), নয়া দিল্লি : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮, প্রথম বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৫১